সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
UNIT-A	**নৈতিকতা (Ethics)**	০১-৭৮
অধ্যায়-১	নৈতিকতা ও নীতিবিদ্যার ধারণা ও ভিত্তি	০৫-১৯
অধ্যায়-২	নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও প্রায়োগিক ধারণা	২০-৩৪
অধ্যায়-৩	উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদ	৩৫-৬৭
অধ্যায়-৪	বিভিন্ন মতবাদ	৬৮-৭৮
UNIT-B	**মূল্যবোধ (Values)**	৭৯-১১০
অধ্যায়-৫	মূল্যবোধ	৮২-৮৯
অধ্যায়-৬	মূল্যবোধ শিক্ষা	৯০-৯৮
অধ্যায়-৭	নাগরিক মূল্যবোধ	৯৯-১০৪
অধ্যায়-৮	সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংকট	১০৫-১১০
UNIT-C	**সুশাসন (Good Governance)**	১১১-২৪২
অধ্যায়-৯	সুশাসনের ধারণা, উপাদান ও ভিত্তি	১১৮-১২৭
অধ্যায়-১০	সুশাসন প্রতিষ্ঠা: প্রতিবন্ধকতা, করণীয় ও ভূমিকা	১২৮-১৩৪
অধ্যায়-১১	সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক অনুষঙ্গ	১৩৫-১৪৪
অধ্যায়-১২	মূল্যবোধ ও সুশাসনের অভাবে সামাজিক অবক্ষয় ও প্রতিকার	১৪৫-১৮৩
অধ্যায়-১৩	সুশাসন: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট	১৮৪-১৯১
অধ্যায়-১৪	বিভিন্ন উন্নয়ন সূচক	১৯২-১৯৮
অধ্যায়-১৫	ই-গভর্নেন্স	১৯৯-২০৭
অধ্যায়-১৬	উন্নয়ন ও অধিকার	২০৮-২১৬
অধ্যায়-১৭	পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র	২১৭-২২৪
অধ্যায়-১৮	রাজনৈতিক ব্যবস্থা	২২৫-২৩৩
অধ্যায়-১৯	বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাঠামো	২৩৪-২৪২
মডেল টেস্ট		**২৪৩-২৪৬**

UNIT A

নৈতিকতা (Ethics)

বিগত সালের প্রশ্নসমূহ

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

১. নিচের কোনটি পেশাগত নৈতিকতার উপাদান? *[৪৭তম বিসিএস]*
ⓚ স্বজনপ্রীতি ⓚ সাম্প্রদায়িকতা
ⓖ দরিদ্রতা ⓖ দক্ষতা **উ. ঘ**

২. উদ্দেশ্য নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় কোনটি? *[৪৭তম বিসিএস]*
ⓚ উদ্দেশ্য ⓚ ফলাফল
ⓖ প্রক্রিয়া ⓖ উপরের সবগুলো **উ. খ**

৩. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে-এ বিষয়ে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? *[৪৭তম বিসিএস]*
ⓚ অনুচ্ছেদ-২১ ⓚ অনুচ্ছেদ-১৮
ⓖ অনুচ্ছেদ-২৮ ⓖ অনুচ্ছেদ-২৬ **উ. খ**

৪. বাংলাদেশের 'নব্য-নৈতিকতার' প্রবর্তক হলেন– *[৪৬তম বিসিএস/৪০তম বিসিএস]*
ⓚ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ⓚ জি. সি. দেব
ⓖ আরজ আলী মাতুব্বর ⓖ আব্দুল মতীন **উ. গ**

৫. কোন শ্রেণির ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত? *[৪৬তম বিসিএস/৩৫তম বিসিএস]*
ⓚ নৈতিকতা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া ⓚ সামাজিক ক্রিয়া
ⓖ ঐচ্ছিক ক্রিয়া ⓖ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া **উ. গ**

৬. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে? *[৪৫তম বিসিএস]*
ⓚ শুদ্ধাচার ⓚ মূল্যবোধ ⓖ মানবিকতা ⓖ সফলতা **উ. ক**

৭. 'শর্তহীন আদেশ' ধারণাটির প্রবর্তক কে? *[৪৫তম বিসিএস]*
ⓚ অ্যারিস্টটল ⓚ বার্ট্রান্ড রাসেল
ⓖ হার্বার্ট স্পেন্সার ⓖ ইমানুয়েল কান্ট **উ. ঘ**

৮. 'Utilitarianism' গ্রন্থের লেখক কে? *[৪৫তম বিসিএস]*
ⓚ জন স্টুয়ার্ট মিল ⓚ ইমানুয়েল কান্ট
ⓖ বার্ট্রান্ড রাসেল ⓖ জেরেমি বেন্থাম **উ. ক**

৯. 'জ্ঞান হয় পুণ্য'– এই উক্তিটি কার? *[৪৫তম বিসিএস]*
ⓚ থেলিস ⓚ সক্রেটিস
ⓖ এরিস্টটল ⓖ প্লেটো **উ. খ**

১০. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসারে 'শুদ্ধাচার' হচ্ছে– *[৪৪তম বিসিএস]*
ⓚ শুদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল
ⓚ সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড
ⓖ সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ
ⓖ দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড **উ. গ**

১১. রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী– *[৪৪তম বিসিএস]*
ⓚ আইনের প্রয়োগের অভাব
ⓚ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব
ⓖ দুর্বল পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা
ⓖ অসৎ নেতৃত্ব **উ. খ**

১২. সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন– *[৪৪তম বিসিএস]*
ⓚ ডেকার্ট ⓚ ডেভিড হিউম
ⓖ ইমানুয়েল কান্ট ⓖ জন লক **উ. গ**

১৩. নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি? *[৪৩তম বিসিএস]*
ⓚ সমাজ ⓚ নৈতিক চেতনা ⓖ রাষ্ট্র ⓖ ধর্ম **উ. খ**

১৪. 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' ধারণাটির প্রবর্তক কে? *[৪৩তম বিসিএস]*
ⓚ ইমানুয়েল কান্ট ⓚ হার্বার্ট স্পেন্সার
ⓖ বার্ট্রান্ড রাসেল ⓖ অ্যারিস্টটল **উ. ক**

১৫. "শাসক যদি মহৎ গুণসম্পন্ন হয় তাহলে আইন নিষ্প্রয়োজন, আর শাসক যদি মহৎগুণসম্পন্ন না হয় তাহলে আইন অকার্যকর" এটি কে বলেছেন? *[৪৩তম বিসিএস]*
ⓚ সক্রেটিস ⓚ প্লেটো
ⓖ অ্যারিস্টটল ⓖ বেনথাম **উ. খ**

অধ্যায়-১

নৈতিকতা ও নীতিবিদ্যার ধারণা ও ভিত্তি

(Concept and Foundation of Morality and Ethics)

নৈতিকতা ও নীতিবিদ্যা মানবজীবনের ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য, দায়িত্ব ও মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত। নৈতিকতা (Morality) মানুষের বাস্তব আচরণ, চরিত্র ও বিবেকবোধকে নির্দেশ করে; আর নীতিবিদ্যা (Ethics) সেই নৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধের যুক্তিনিষ্ঠ ও দার্শনিক বিশ্লেষণ করে।

মানুষ ব্যক্তি হিসেবে যেমন নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়, তেমনি সমাজ, আইন, রাষ্ট্র, প্রশাসন ও সুশাসনের ক্ষেত্রেও নৈতিকতার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক বিচার (Moral judgment), নৈতিক বাধ্যতাবোধ (Moral obligation), ইচ্ছার স্বাধীনতা, বিবেক, অধিকার, কর্তব্য ও সামাজিক দায়িত্ব– এসব ধারণা নৈতিক জীবনকে বুঝতে সহায়তা করে।

এই অধ্যায়ে নৈতিকতা ও নীতিবিদ্যার ধারণা, সংজ্ঞা, প্রকৃতি, আলোচ্য বিষয়, নৈতিক প্রত্যয়, ঐতিহাসিক বিকাশ, উৎস, আইন-নৈতিকতার সম্পর্ক, সুশাসন ও মূল্যবোধের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক এবং নীতিবিদ্যা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

১. নীতিবিদ্যা

১.১ নীতিবিদ্যার ধারণা

নীতিবিদ্যা দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যেখানে মানুষের আচরণ, চরিত্র, উদ্দেশ্য, কর্তব্য এবং ভালোমন্দের বিচার নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানুষ কোন কাজ করলে তা ন্যায় বা অন্যায়, ভালো বা মন্দ, উচিত বা অনুচিত বলে বিবেচিত হবে নীতিবিদ্যা সেই প্রশ্নের যুক্তিসংগত ও আদর্শনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে।

নীতিবিদ্যার আলোচনায় সব ধরনের মানবক্রিয়া সমানভাবে বিবেচ্য নয়। যে কাজ মানুষের ইচ্ছা, বিচার-বিবেচনা ও স্বাধীন পছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, সেই কাজই নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত। অনৈচ্ছিক, স্বতঃস্ফূর্ত বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ক্রিয়ার নৈতিক মূল্য সাধারণত নির্ধারিত হয় না। এ কারণে নীতিবিদ্যা মূলত মানুষের ঐচ্ছিক ও অভ্যাসজাত আচরণের ভালোমন্দ বিচার করে।

নীতিবিদ্যাকে তাই মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা যায়। এটি কেবল মানুষ কীভাবে আচরণ করে তা বর্ণনা করে না; বরং মানুষ কীভাবে আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে মানদণ্ড নির্ধারণ করে।

১.২ নীতিবিদ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

ইংরেজি Ethics শব্দটি গ্রিক Ethos শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ আচার-ব্যবহার, রীতি, চরিত্র বা অভ্যাস। গ্রিক Ethika শব্দের সঙ্গেও Ethics শব্দটির সম্পর্ক রয়েছে। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে তাই Ethics বলতে মানুষের আচার, চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কিত আলোচনা বোঝায়।

ইংরেজি Moral শব্দটি লাতিন Mores শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থও রীতি, প্রথা, আচার বা সামাজিক আচরণ। এ কারণে নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতা উভয় ধারণার সঙ্গে মানুষের আচরণ, রীতি, চরিত্র ও সামাজিক জীবন গভীরভাবে যুক্ত।

সুতরাং, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চরিত্র ও অভ্যাসের ভালোমন্দ বিচার সম্পর্কিত বিদ্যা।

১.৩ নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা

নীতিবিদ্যাকে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এসব সংজ্ঞায় সাধারণত মানুষের আচরণ, নৈতিক মূল্য, ভালো মন্দ বিচার এবং নৈতিক আদর্শের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- ম্যাকেঞ্জি বলেন, Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct। অর্থাৎ আচরণের ক্ষেত্রে কী সঠিক বা ভালো তার অধ্যয়নই নীতিবিদ্যা।

- উইলিয়াম লিলির মতে, নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় এমন এক আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা এই আচরণকে ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ অথবা অনুরূপ কোনো মানদণ্ডে বিচার করে।

- পি. ডব্লিউ. টেইলরের মতে, নীতিবিদ্যা হলো নৈতিকতার প্রকৃতি ও ভিত্তি সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধান।

সাধারণ অর্থে, নীতিবিদ্যা হলো এমন এক শাস্ত্র, যা মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করে এবং ভালো জীবন, কর্তব্য, দায়িত্ব ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে যুক্তিসংগত আলোচনা করে।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-২

নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্ব ও প্রায়োগিক ধারণা
(Ethical Theories and Applied Concepts)

নৈতিকতা শুধু সাধারণ ভালোমন্দ বিচার নয়; এটি বিভিন্ন নৈতিক তত্ত্ব, মূল্যবোধ, সিদ্ধান্ত ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে মানব আচরণকে বিশ্লেষণ করে। নৈতিক তত্ত্বগুলো মানুষের সুখ, কল্যাণ, কর্তব্য, চরিত্র, স্বাধীনতা, বিচারবোধ ও সামাজিক দায়িত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়।

এই অধ্যায়ে সুখবাদ বা ভোগবাদ (Hedonism), উপযোগবাদ (Utilitarianism), নব্য উপযোগবাদ (Neo-Utilitarianism), পূর্ণতাবাদ (Perfectionism), সমকালীন নীতিবিদ্যা (Contemporary Ethics), সদগুণ ও সুবর্ণ মধ্যক (Virtue and Golden Mean), ক্রীড়া তত্ত্ব (Game Theory), জিরো-সাম গেম (Zero-Sum Game) এবং নন-জিরো-সাম গেম (Non-Zero-Sum Game) আলোচনা করা হয়েছে।

এসব তত্ত্ব ও ধারণা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নৈতিক সিদ্ধান্ত বুঝতে সহায়তা করে। তাই অধ্যায়টি নৈতিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তির পাশাপাশি বাস্তব জীবনের সিদ্ধান্ত, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও জনকল্যাণের প্রশ্নকেও গুরুত্ব দেয়।

১. সুখবাদ বা ভোগবাদ (Hedonism)

১.১ সুখবাদের ধারণা

সুখবাদ বা ভোগবাদ হলো এমন একটি নৈতিক মতবাদ, যার মতে সুখই নৈতিক আদর্শ। মানুষের কাজের নৈতিক গুণাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুখকে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। যে কাজ সুখ সৃষ্টি করে এবং দুঃখ কমায়, সেই কাজ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য; আর যে কাজ দুঃখ, কষ্ট বা অকল্যাণ সৃষ্টি করে, তা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য।

Hedonism শব্দটি গ্রিক Hedone শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অর্থ সুখ, আনন্দ বা pleasure। সুখবাদ অনুসারে সুখই মানবজীবনের পরমকল্যাণ। সুখ অন্বেষণ করা এবং দুঃখ পরিহার করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা; নৈতিক জীবনে এই প্রবণতাকে একটি আদর্শ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

এই দৃষ্টিতে সুখবাদ মানুষের নৈতিক আচরণকে সুখ-দুঃখের আলোকে বিচার করে। কোনো কাজ যদি সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি বা কল্যাণ সৃষ্টি করে, তবে সেটি নৈতিকভাবে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়; আর যদি কাজটি দুঃখ, ক্ষতি বা অকল্যাণ সৃষ্টি করে, তবে সেটি অনৈতিক বা অনুচিত বলে বিবেচিত হয়।

১.২ সুখবাদের ভিত্তি

সুখবাদের দুটি প্রধান ভিত্তি রয়েছে–

১. মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি (Psychological basis)
২. পরাবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Metaphysical basis)

১. মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি : সুখবাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হলো–মানুষ স্বভাবত সুখ অন্বেষণ করে এবং দুঃখ পরিহার করে। মানুষের কামনা, সিদ্ধান্ত ও আচরণের পেছনে সুখলাভ এবং দুঃখ বিমুখতার প্রবণতা কাজ করে। মানুষ সাধারণত এমন কাজ করতে চায়, যা তাকে আনন্দ, তৃপ্তি বা কল্যাণ দেয়; এবং এমন কাজ এড়িয়ে চলতে চায়, যা কষ্ট, ক্ষতি বা দুঃখ সৃষ্টি করে।

২. পরাবৈজ্ঞানিক ভিত্তি : সুখবাদের পরাবৈজ্ঞানিক ভিত্তি হলো–মানুষের মনকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, আনন্দ, বেদনা ও তৃপ্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে ধরা হয়। সুখবাদী ব্যাখ্যায় মানুষের মন অনেক সময় ইন্দ্রিয়াসক্ত (sensuous) বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, আনন্দ ও দুঃখের অভিজ্ঞতা মানবজীবনের মৌলিক বাস্তবতা হিসেবে কাজ করে। এই কারণে সুখবাদে ইন্দ্রিয় অনুভূতি, আনন্দ ও দুঃখ নৈতিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।

সুখবাদী মত অনুসারে–

- সুখ কাম্য;
- দুঃখ পরিহারযোগ্য;
- সুখ মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য;
- যে কাজ সুখ সৃষ্টি করে, তা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য;
- যে কাজ দুঃখ বা অকল্যাণ সৃষ্টি করে, তা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য;
- নৈতিক বিচার করতে হলে কাজের সুখকর বা দুঃখকর ফল বিবেচনা করতে হয়।

১.৩ মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ (Psychological Hedonism)

মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ হলো সুখবাদের এমন একটি রূপ, যেখানে বলা হয়– মানুষ বাস্তবে স্বভাবত সুখ লাভ করতে এবং দুঃখ এড়াতে চায়। এটি মূলত মানুষের আচরণের একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

এই অনুসারে মানুষ যে কাজই করে, তার পেছনে কোনো না কোনো সুখলাভের প্রত্যাশা বা দুঃখ পরিহারের প্রবণতা থাকে। মানুষ খাদ্য, বিশ্রাম, সম্পদ, সম্মান, নিরাপত্তা, সম্পর্ক, জ্ঞান বা ক্ষমতা যাই কামনা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সে কোনো ধরনের সুখ, তৃপ্তি বা দুঃখমুক্ত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-৩

উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদ
(Notable Philosophers and Ethical Thinkers)

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন– এই তিনটি ধারণার দার্শনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে দুই হাজার পাঁচশো বছরেরও বেশি সময়ের চিন্তাধারার ধারাবাহিকতায়। প্রাচীন গ্রিসে সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল সৎ জীবন, ন্যায়বিচার, গুণ, জ্ঞান ও আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণার গোড়াপত্তন করেন। প্রাচ্যে কনফুসিয়াস নৈতিক শাসন ও সামাজিক শৃঙ্খলার ধারণা, সান জু কৌশলগত নেতৃত্ব ও যুদ্ধনীতির কাঠামো এবং কৌটিল্য বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতি, প্রশাসন ও কূটনীতির বিশ্লেষণধর্মী উপস্থাপন করেন। রেনেসাঁ পরবর্তী যুগে ম্যাকিয়াভেলি প্রচলিত ধর্মীয় নৈতিক ভাষ্য থেকে রাজনীতির বাস্তববাদী বিশ্লেষণকে আলাদা করেন, এনলাইটেনমেন্ট যুগে কান্ট কর্তব্যবাদী নীতিশাস্ত্রকে সুসংগঠিত করেন, আর বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিল উপযোগবাদকে শক্তিশালী তাত্ত্বিক রূপ দেন। উনিশ শতকে হেগেল, মার্কস ও নিৎসে ইতিহাস, সমাজ, ক্ষমতা ও মূল্যবোধকে দার্শনিক বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে বার্ট্রান্ড রাসেল ও পিটার সিঙ্গার যুক্তি, শান্তিবাদ, প্রাণীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব, কার্যকর পরোপকার ও ফলিত নীতিশাস্ত্রকে নতুন করে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের চিন্তাজগতে আরজ আলী মাতুব্বর, গোবিন্দ চন্দ্র দেব ও সরদার ফজলুল করিম যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, সমন্বয়ী দর্শন ও বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রাখেন। এই অধ্যায়ে উনিশ জন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, দর্শন ও ধারণা, প্রধান সাহিত্যকর্ম এবং অবদান উপস্থাপিত হয়েছে।

কনফুসিয়াস (Confucius) *[খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫১–৪৭৯]*

কনফুসিয়াস ছিলেন প্রাচীন চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতিবাদী দার্শনিক। তাঁর প্রকৃত নাম Kong Qiu বা খোং ছিউ। Kong Fuzi বা "মাস্টার কং" ছিল তাঁর সম্মানসূচক নাম; পাশ্চাত্যে তিনি Confucius নামে পরিচিত।

তাঁর বিশ্বাস ছিল শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও নৈতিক শাসন– এই তিনটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খল করে। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ, পরিবারিক কর্তব্য, সামাজিক শৃঙ্খলা, শাসকের ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবিকতা।

জন্ম, পরিবার ও ব্যক্তিজীবন : কনফুসিয়াস প্রাচীন চীনের লু রাজ্যের Qufu অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন, যা বর্তমান চীনের শানডং (Shandong) প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের পুত্রের নাম ছিল Kong Li।

জীবনের শুরুর দিকে কনফুসিয়াস বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। একসময় তিনি 'রু' নামক সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাজের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ও আচার অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। চাকরি জীবনেই তিনি প্রাচীন চীনের ছয় কলা (সদাচরণ/আচার, সংগীত, ধনুর্বিদ্যা, রথ বা শকট চালনা, লেখালেখি এবং গণিতশাস্ত্র) বা Six Arts-এ পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে কনফুসিয়াস রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০১ সালের দিকে তিনি লু রাজ্যের একটি ছোট শহরের প্রশাসনিক দায়িত্ব পদ গ্রহণ করেন বলে প্রচলিত। তবে 'প্রধানমন্ত্রী' পদে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কনফুসিয়াসের ৩,০০০-এর বেশি শিষ্য ছিল বলে প্রচলিত আছে। তাঁদের মধ্যে ৭২ বা ৭৭ জনকে বিশেষভাবে যোগ্য বা "worthy" হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার তাঁদের মধ্যে কিছু শিষ্যকে "কনফুসীয় স্কুলের দশজন জ্ঞানী" হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে Yan Hui, Zilu/Zhong You, Zigong, Zeng Shen এবং Zai Yu-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

দর্শন ও অবদান : কনফুসিয়াসের দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন। তিনি মনে করতেন, রাষ্ট্রের স্থিতি ও সুশাসন শুরু হয় ব্যক্তির নৈতিক উন্নয়ন, পরিবারিক দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক আচরণ থেকে। শাসক যদি ন্যায়পরায়ণ, সংযত ও মানবিক হন, তবে জনগণও নৈতিক আচরণে উদ্বুদ্ধ হয়।

কনফুসীয় দর্শনের কয়েকটি কেন্দ্রীয় ধারণা হলো–

- Ren (মানবিকতা, দয়া বা benevolence)
- Li (শিষ্টাচার, আচার, সামাজিক নিয়ম ও সঠিক আচরণ)
- Xiao (পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা বা filial piety)
- Yi (ন্যায়পরায়ণতা)
- Junzi (আদর্শ নৈতিক ব্যক্তি বা gentleman)
- Moral Governance (শাসকের নৈতিকতার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা)

কনফুসিয়াস শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের প্রধান উপায় হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, নৈতিক শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি জ্ঞানী হলেও সমাজের জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে না। তাই তাঁর দর্শনে শিক্ষা শুধু তথ্য অর্জন নয়; বরং ন্যায়, শিষ্টাচার, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতার চর্চা।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-৪

বিভিন্ন মতবাদ
(Ideologies)

মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে কীভাবে দেখা হবে– এই প্রশ্নের উত্তর থেকেই বিভিন্ন মতবাদ (Ideology)-এর জন্ম। কোনো মতবাদ কেবল একটি রাজনৈতিক স্লোগান নয়; বরং এটি এক ধরনের চিন্তা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি, স্বাধীনতা, সাম্য, অধিকার, ধর্ম, জাতি, শ্রেণি, ক্ষমতা ও সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হয়।

ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ মানুষের রাজনৈতিক আচরণ, রাষ্ট্রগঠন, বিপ্লব, যুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক সংস্কারকে প্রভাবিত করেছে। উদারতাবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে; সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণের প্রশ্ন সামনে এনেছে; ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ রাষ্ট্রক্ষমতার চরম কেন্দ্রীকরণের বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে; নৈরাজ্যবাদ রাষ্ট্র ও কর্তৃত্বের ধারণাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে; বাস্তববাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ক্ষমতা ও জাতীয় স্বার্থের আলোকে ব্যাখ্যা করেছে; আর পঞ্চশীলার মতো নীতিমালা রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি তৈরি করেছে।

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের আলোচনায় মতবাদ জানা জরুরি, কারণ প্রতিটি মতবাদ কোনো না কোনোভাবে মানুষের অধিকার, কর্তব্য, ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং নাগরিক জীবনের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। তাই এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদগুলোর মূল ধারণা, বৈশিষ্ট্য, প্রবক্তা, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং পরীক্ষামুখী তথ্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

১. পুঁজিবাদ (Capitalism)

পুঁজিবাদ (Capitalism) হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপকরণ– যেমন জমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, পুঁজি ও প্রাকৃতিক সম্পদ–প্রধানত ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হয় মুনাফা অর্জন।

এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে উৎপাদন, বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের (Demand and Supply) ভিত্তিতে।

স্কটিশ অর্থনীতিবিদ Adam Smith-কে আধুনিক পুঁজিবাদের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Wealth of Nations*-এ তিনি "অদৃশ্য হাত" বা Invisible Hand ধারণার মাধ্যমে বোঝান যে বাজারের স্বাভাবিক চাহিদা-যোগান প্রক্রিয়া মূল্য ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ধারণা পরবর্তীতে Laissez-faire নীতির ভিত্তি তৈরি করে। Laissez-faire অর্থ অর্থনীতিকে তার নিজস্ব নিয়মে চলতে দেওয়া।

পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য

- ব্যক্তিগত মালিকানা;
- মুনাফা অর্জন;
- উদ্যোগের স্বাধীনতা;
- অবাধ প্রতিযোগিতা;
- ভোক্তার সার্বভৌমত্ব;
- বাজার ও দামব্যবস্থা;
- সীমিত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ;
- শ্রেণিবিভাজন ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক।

পুঁজিবাদের সুবিধা

- উৎপাদন বৃদ্ধি পায়;
- প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটে;
- উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবন উৎসাহিত হয়;
- প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের মান উন্নত হতে পারে;
- দক্ষতা ও সম্পদের ব্যবহার বাড়ে।

পুঁজিবাদের সমালোচনা

- সম্পদের অসম বণ্টন;
- শ্রমিক শোষণের সম্ভাবনা;
- একচেটিয়া বাজার বা Monopoly;
- জনস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত মুনাফাকে বেশি গুরুত্ব;
- ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বৃদ্ধি।

২. সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) হলো এমন একটি নীতি বা প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্র, জাতি বা অঞ্চলের ওপর রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি দখল, উপনিবেশ স্থাপন, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, কূটনৈতিক প্রভাব বা সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে কার্যকর হতে পারে।

UNIT B

মূল্যবোধ (Values)

বিগত সালের প্রশ্নসমূহ

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

১. সাধারনের দৃষ্টিতে কোনটি মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য? *[৫০তম বিসিএস]*
ক আইনের নির্বাচনী প্রয়োগ
খ নাগরিকের অংশগ্রহণ
গ কর্তৃত্ববাদ
ঘ গোপনীয়তা **উ. খ**

২. শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কোনটি? *[৫০তম বিসিএস]*
ক ঘন ঘন আইনের সংস্কার
খ নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি
গ নৈতিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয়
ঘ আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি **উ. গ**

৩. মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপস্থিতি জাতীয় উন্নয়নের কোন দিকটিকে বেশি টেকসই করে তোলে? *[৫০তম বিসিএস]*
ক স্বল্পমেয়াদি প্রবৃদ্ধি খ অবকাঠামো নির্মান
গ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘ আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ **উ. গ**

৪. কোনটি মূল্যবোধের সারসত্তাকে প্রতিফলিত করে? *[৫০তম বিসিএস]*
ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত নিয়ম
খ নৈতিক নির্দেশ ছাড়া প্রথা ও ঐতিহ্য
গ নৈতিক আচরন নির্দেশক বিশ্বাস ও নীতি
ঘ সামাজিক শৃংখলার আইনি বাধ্যবাধকতা **উ. গ**

৫. মূল্যবোধ ও শাসনের মধ্যে সম্পর্ক হলো– *[৫০তম বিসিএস]*
ক নৈতিক নীতি, নিয়ম ও রাজনৈতিক নির্দেশ মানা
খ নৈতিক নীতি, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা
গ স্তরবিন্যাস, স্বচ্ছতা ও ঐতিহ্য
ঘ নৈতিকতা ছাড়া প্রশাসনিক দক্ষতা **উ. খ**

৬. জীবনের তিনটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ কী কী? *[৫০তম বিসিএস]*
ক সম্পদ, ক্ষমতা ও সদগূন
খ সত্য, আনন্দ ও সদগূন
গ সত্য, সুন্দর ও সদগুন
ঘ আনন্দ, বিবেক ও সাহস **উ. গ**

৭. সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো বেশি উদ্ভূত হয় 'সামাজিক —' থেকে। *[৫০তম বিসিএস]*
ক আচরন খ বৈষম্য গ প্রথা ঘ নীতি **উ. গ**

৮. মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে– *[৪৭তম বিসিএস]*
ক আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে
খ সামাজিকীকরণের মাধ্যমে
গ অর্থনৈতিক প্রণোদনার মাধ্যমে
ঘ উচ্চমানের প্রযুক্তি অনুসরণের মাধ্যমে **উ. খ**

৯. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশটি গৃহীত হয়? *[৪৭তম বিসিএস]*
ক ৩১ জানুয়ারি, ২০০৩ খ ৩১ অক্টোবর, ২০০৬
গ ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ ঘ ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ **উ. গ**

১০. ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা– *[৪৭তম বিসিএস]*
ক ১৯২টি খ ১০৯টি গ ১৯০টি ঘ ১৯১টি **উ. ঘ**
ব্যাখ্যা : ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত United Nations Convention Against Corruption স্বাক্ষরকারী দেশ ছিল ১৯১টি।
উৎস: UNCAC ওয়েবসাইট।

১১. ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ? *[৪৫তম বিসিএস]*
ক নৈতিক খ অর্থনৈতিক
গ রাজনৈতিক ঘ সামাজিক **উ. ক**
ব্যাখ্যা : ভালো-মন্দ নৈতিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধ নির্ধারিত হয় আচরণের মাধ্যমে অর্থাৎ, এর মাধ্যমে মানুষ 'ভুল' ও 'শুদ্ধ', ভালো ও মন্দ-এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে এবং এটি মানুষের আচরণের মাপকাঠি স্বরূপ।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-৫

মূল্যবোধ
(Values)

মূল্যবোধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Value। যে চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তাকেই সাধারণত মূল্যবোধ বলা হয়। মূল্যবোধ মানুষের ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্য এবং গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য আচরণ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। তাই মূল্যবোধ ব্যক্তি ও সমাজ–উভয় ক্ষেত্রেই আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের অন্যতম ভিত্তি। সমাজ জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-ব্যবহার যে নীতি, আদর্শ ও মানদণ্ডের মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাদের সমষ্টিকে সামাজিক মূল্যবোধ বলা হয়। সামাজিক মূল্যবোধ সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতামূলক আচরণ গঠনে সহায়তা করে।

অর্থাৎ, মূল্যবোধ হলো–

- ভালো বা মন্দ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা;
- কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের বিশ্লেষণমূলক রায়;
- মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড;
- ব্যক্তি ও সমাজের গ্রহণযোগ্য আচার-আচরণের ভিত্তি;
- ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণের নৈতিক কাঠামো;
- ব্যক্তিগত চরিত্র, সামাজিক সম্পর্ক ও সমষ্টিগত জীবনযাপনের দিকনির্দেশক।

১. মূল্যবোধের সংজ্ঞা

● এম. আর. উইলিয়াম (M. R. William)-এর মতে, "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদণ্ড। এর আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদণ্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালোমন্দ বিচার করা হয়।"

● এম. ডব্লিউ. পামফ্রে (M. W. Pumphrey)-এর মতে, "মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"

● ফ্রাঙ্কেল (Frankel) মনে করেন, "মূল্যবোধ হলো আবেগিক ও আদর্শগত ঐক্যের বোধ।"

● এইচ. এম. জনসন (H. M. Johnson)-এর মতে, "মূল্যবোধ সাধারণ মানদণ্ড এবং ইচ্ছাশক্তির রীতিনীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।"

● এইচ. ডি. স্টেইন (H. D. Stein)-এর মতে, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান এবং যা সম্পাদনের মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করে, তাকেই মূল্যবোধ বলে।"

● স্টেইনবেক (Steinbeck)-এর মতে, "সেসব কাজ, অভিজ্ঞতা ও নীতি মানুষের শুভবুদ্ধির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ঘটায়, তা হলো মূল্যবোধ।"

● স্টুয়ার্ট সি. ডড (Stuart C. Dodd) বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সে সব রীতিনীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে আশা করে এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।"

● এফ. ই. মেরিল (F. E. Merrill) বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরন, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।"

● ক্লাইড কুখোন (Clyde Kluckhohn)-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব প্রকাশ্য ও অনুমেয় আচার-আচরণের ধারা, যা ব্যক্তি ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত।"

● নিকোলাস রেসার (Nicholas Rescher)-এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ সেসব গুণাবলি, যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।"

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-৬

মূল্যবোধ শিক্ষা
(Value Education)

মানুষ জন্মগতভাবে কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে আসে, কিন্তু তাকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে শিক্ষা। শিক্ষা কেবল জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চরিত্র, মূল্যবোধ ও নৈতিক বোধ গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। একটি সমাজ তখনই সুশৃঙ্খল ও মানবিক হয়, যখন সেই সমাজের মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝে, দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যের প্রতি সহনশীল থাকে। এসব গুণ শুধু আইন দিয়ে তৈরি করা যায় না; এগুলো গড়ে ওঠে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারাবাহিক মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে। তাই পরিবার থেকে শুরু করে বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্র–প্রতিটি স্তরেই মূল্যবোধ শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য।

গণতান্ত্রিক সমাজে সুনাগরিক গড়ে তোলা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করা–সবকিছুর ভিত্তিতেই রয়েছে মূল্যবোধ শিক্ষা। দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর পথ হলো মানুষের ভেতরে নৈতিক চেতনা, দায়িত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

১. শিক্ষা

দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা। অন্যভাবে, জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে। তবে শিক্ষা কেবল তথ্য জানা বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বিষয় নয়; শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তি, বিচারবোধ, চরিত্র, আচরণ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

শিক্ষা মানুষকে নিজেকে জানতে, সমাজকে বুঝতে এবং দায়িত্বশীলভাবে জীবন পরিচালনা করতে সহায়তা করে। শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি 'Education'। অনেকের মতে, Education শব্দটি ল্যাটিন 'Educare' থেকে এসেছে। Educare বলতে 'to bring up, to nourish, to develop' বোঝায়। ভাবগত অর্থে শিক্ষা ব্যক্তিকে লালন করে, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটায় এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করে।

শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা, সামাজিকতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ অর্জন করে। শিক্ষা মানুষকে কর্তব্য ও দায়িত্বের সীমা বুঝতে এবং সমাজে মানবিকভাবে বাঁচতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষা ব্যক্তিগত উন্নয়ন, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং মানবিক মূল্যবোধ গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষা একটি–

- মানবীয় প্রচেষ্টা;
- ধারাবাহিক প্রক্রিয়া;
- জীবন ঘনিষ্ঠ নির্দেশনা;
- ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের উপায়;
- জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জনের মাধ্যম;
- চূড়ান্ত অভীষ্ট 'বিকাশ'।

শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি–

- "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যের আবিষ্কার ও মিথ্যার অপনোদন।" (সক্রেটিস)
- "শিক্ষা হচ্ছে সঠিক মুহূর্তে আনন্দ ও বেদনা অনুভব করতে পারার ক্ষমতা বা শক্তি।" (প্লেটো)
- "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা।" (অ্যারিস্টটল)

২. শিক্ষার কাজ

শিক্ষার কাজ কেবল জ্ঞান প্রদান করা নয়; শিক্ষা ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ, মূল্যবোধ, দক্ষতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষা মানুষকে নিজের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শেখায় এবং তাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলে।

শিক্ষার প্রধান কাজ হলো–

- ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের সংগতি বিধানে সহায়তা করা;
- ব্যক্তিকে ইপ্সিত আচরণে উদ্বুদ্ধ করা;
- জ্ঞান, দক্ষতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো;
- নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে সহায়তা করা;
- ব্যক্তিকে সমাজজীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- সমাজের জীবনাদর্শ, মৌলিক বিশ্বাস, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণ ও রীতিনীতির সঙ্গে ব্যক্তিকে পরিচিত করা;
- দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা;
- ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর, সচেতন ও সৃজনশীল করে তোলা;
- সামাজিক ঐক্য, সহযোগিতা ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা।

অতএব, শিক্ষা ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পাশাপাশি সমাজের ধারাবাহিকতা, শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

৩. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনটি ধাপে গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রাথমিক জ্ঞান, সামাজিক আচরণ, নৈতিকতা, দক্ষতা এবং উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

অধ্যায়-৭
নাগরিক মূল্যবোধ
(Civic Values)

একজন মানুষ কেবল রাষ্ট্রের অধিবাসী হলেই নাগরিক হয়ে ওঠে না; নাগরিক হতে হলে তাকে সমাজ, রাষ্ট্র, আইন ও অন্য মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতন হতে হয়। এই সচেতনতা থেকেই জন্ম নেয় নাগরিক মূল্যবোধ (Civic Values)। নাগরিক মূল্যবোধ হলো এমন কিছু নৈতিক ও সামাজিক গুণ, যা মানুষকে সহনশীল, দায়িত্বশীল, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, স্বাধীনতা সচেতন ও সাম্যভিত্তিক সমাজ জীবনের উপযোগী করে তোলে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গণতন্ত্র কেবল ভোট, সরকার বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে টিকে থাকে না; এটি টিকে থাকে নাগরিকের আচরণ, পরস্পরের মতের প্রতি সম্মান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার এবং সাম্যের চেতনার ওপর। যে সমাজে নাগরিকরা সহিষ্ণু নয়, পরমতকে সম্মান করে না, আইন মানে না, স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচার মনে করে এবং সাম্যকে গুরুত্ব দেয় না– সেখানে গণতন্ত্র, সুশাসন ও সামাজিক শান্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই অধ্যায়ে নাগরিক জীবনের কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধ– সহিষ্ণুতা, পরমতসহিষ্ণুতা, আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. সহিষ্ণুতা

১.১ সহিষ্ণুতার ধারণা

সহিষ্ণুতা (Tolerance) অর্থ সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা এবং ভিন্ন মত, বিশ্বাস, আচরণ বা পরিস্থিতিকে শান্তভাবে গ্রহণ করার মানসিক ক্ষমতা। এটি এমন একটি মানবিক গুণ, যা মানুষকে বিরূপ পরিস্থিতি, কষ্ট, মতভেদ বা অপছন্দনীয় আচরণের মুখেও সংযত, ন্যায়নিষ্ঠ ও শান্ত থাকতে সাহায্য করে।

সহিষ্ণুতা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র–সব ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। সহিষ্ণুতা না থাকলে সামাজিক সম্পর্ক দুর্বল হয়, মতভেদ সংঘাতে রূপ নেয় এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১.২ সহিষ্ণুতার মূল উপাদান

- **সহনশীলতা :** অন্যের মতামত, ধর্ম, সংস্কৃতি বা আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
- **ধৈর্য :** কষ্ট, অপকার, বিরোধিতা বা বিরূপ পরিস্থিতিতে অস্থির না হয়ে শান্ত থাকা;
- **ক্ষমাশীলতা :** প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত থাকা;
- **সহাবস্থান :** ভিন্ন মত, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়ের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা;
- **আত্মসংযম :** আবেগের বশবর্তী হয়ে অন্যের অধিকার বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করা।

১.৩ সহিষ্ণুতার গুরুত্ব

- এটি সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখে;
- সংঘাত, বিদ্বেষ ও সহিংসতা কমায়;
- ভিন্নমত গ্রহণের সংস্কৃতি তৈরি করে;
- পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়ায়;
- গণতান্ত্রিক আলোচনাকে শক্তিশালী করে;
- ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করে;
- মানবিক মূল্যবোধ ও নাগরিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে।

১.৪ সহিষ্ণুতা সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় ধৈর্য, সংযম ও সহনশীলতাকে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হিসেবে দেখা হয়।
- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাচরণে ধৈর্য, ক্ষমা ও সহনশীলতার বহু উদাহরণ আলোচিত।
- Helen Keller-এর সহনশীলতা বিষয়ক বক্তব্যের সারমর্ম হলো– সহনশীলতা মানসিক পরিপক্বতা ও সচেতন চর্চার ফল।
- Dalai Lama-এর দৃষ্টিতে, বিরোধী বা শত্রুর সঙ্গে আচরণও সহনশীলতা চর্চার বড় ক্ষেত্র; কারণ বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেই মানুষের ধৈর্য ও সহমর্মিতা পরীক্ষা হয়।

১.৫ সহিষ্ণুতা ও নাগরিক জীবন

নাগরিক জীবনে সহিষ্ণুতা কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয়; এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজে সবাই একই মত, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক অবস্থানের অনুসারী হবে না। তাই মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অন্যের মর্যাদা রক্ষা করা সহিষ্ণু নাগরিকের দায়িত্ব।

অধ্যায়-৮

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংকট
(Culture and the Crisis of Values)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ যে ভাষা, বিশ্বাস, রীতিনীতি, প্রথা, মূল্যবোধ ও জীবনযাপনের পদ্ধতি গড়ে তোলে, তার সামগ্রিক রূপই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কেবল শিল্প, সাহিত্য, উৎসব বা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি সমাজের চিন্তাধারা, মানসিকতা, জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের ধারক।

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ পরস্পর নির্ভরশীল। সংস্কৃতি মূল্যবোধের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। কোনো সমাজে কী সত্য, কী ন্যায়, কী সুন্দর, কী গ্রহণযোগ্য এবং কী অগ্রহণযোগ্য–তা অনেকাংশে নির্ধারিত হয় সেই সমাজের সংস্কৃতির মাধ্যমে। আবার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সংস্কৃতিও বিকৃত হয়ে পড়ে এবং সামাজিক আচরণে নৈতিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

আধুনিক সমাজে দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, বিশ্বায়ন, অপসংস্কৃতির প্রভাব, ভোগবাদী মানসিকতা এবং নৈতিক শিক্ষার ঘাটতির কারণে মূল্যবোধের সংকট ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। দুর্নীতি, যৌতুকপ্রথা, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং খাদ্যে ভেজালের মতো সামাজিক সমস্যাগুলো এই মূল্যবোধ সংকটেরই বহিঃপ্রকাশ।

১. সংস্কৃতির ধারণা ও সংজ্ঞা

ইংরেজি Culture শব্দটির উৎপত্তি লাতিন ক্রিয়াপদ Colere থেকে, যার অর্থ চাষ করা।

● ই. বি. টেইলর (E. B. Tylor)-এর মতে, "জ্ঞানবিজ্ঞান, আচারবিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইনকানুন এবং অনুশীলন ও অভ্যাস, যা মানুষ কোনো এক সমাজের পরিবেশে আয়ত্ত করে, সেসব কিছুই সে সমাজের সংস্কৃতি।" অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে সব দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করে, তাই সংস্কৃতি।

● অ্যান্থনি গিডেন্স (Anthony Giddens) ১৯৯৩ সালে সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ এবং বস্তুগত দ্রব্য হিসেবে।

সংস্কৃতি-মূল্যবোধের চালিকাশক্তি : সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটি সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, ধর্ম, বিশ্বাস, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সামাজিক আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি। সংস্কৃতি ব্যক্তি ও সমাজের মনন, চিন্তা ও আচরণের ভিত গড়ে তোলে। সংস্কৃতিই সমাজের মানুষের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এটি নাগরিকের আত্মপরিচয়ের বাহন।

২. সংস্কৃতির ধরন

জনপ্রিয় সংস্কৃতি : জনপ্রিয় সংস্কৃতি প্রধানত গণমাধ্যমভিত্তিক সংস্কৃতি, যা প্রায় একই রূপে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় এবং তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে অনেক সময় Mass Culture বা গণসংস্কৃতি বলা হয়। Mass Culture বা গণসংস্কৃতিতে রুচির অবনতি ঘটতে পারে; সরল, উপভোগ্য এবং নৃশংস বিষয় এখানে প্রাধান্য পায়।

লোক সংস্কৃতি : লোক সংস্কৃতি বলতে গ্রামীণ বা কৃষকের সংস্কৃতিকে বোঝায়, যেখানে প্রধানত ধর্ম, ঐন্দ্রজালিকতা এবং জ্ঞাতি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রতীকি কাল্পনিক জগত নির্মিত হয়।

উপসংস্কৃতি (Sub-culture) : উপসংস্কৃতি বলতে সমাজের কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও অনুশীলনকে বোঝায়, যা বৃহত্তর সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারকারী সংস্কৃতির মৌলিক বিষয়বস্তু থেকে আলাদা ধরনের সংস্কৃতিকে উপসংস্কৃতি বলে।

অপসংস্কৃতি (Degenerate Culture) : মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে মার্জিত রূপের পরিবর্তে সংস্কৃতির বিকৃত রূপের বিকাশকে অপসংস্কৃতি বলা হয়।

বিপরীত সংস্কৃতি : উপসংস্কৃতি যখন প্রধান সংস্কৃতির বিরোধিতা করে, তার প্রধান মূল্যবোধ ও নীতিমালাকে বাতিল করে বিপরীত মূল্যবোধ, নীতিবোধ ও জীবনাচরণ গ্রহণ করে, তখন তাকে বিপরীত সংস্কৃতি বলে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ১৯৬৮ সালের ছাত্র আন্দোলন, হিপ্পি আন্দোলন এবং পরিবেশবাদী সবুজ আন্দোলন বিপরীত সংস্কৃতির উদাহরণ।

UNIT C

সুশাসন (Good Governance)

বিগত সালের প্রশ্নসমূহ

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা

১. সুশাসন কোন বিষয়টির প্রতিশ্রুতি দেয়? *[৫০তম বিসিএস]*
ক শুধুমাত্র কঠোর আইন প্রয়োগের
খ রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের
গ সংস্কার ছাড়া ঐতিহ্য সংরক্ষণের
ঘ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্বের **উ. ঘ**

২. কোনটি সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সমাজ যে 'hidden cost' বহন করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ? *[৫০তম বিসিএস]*
ক কর আদায়ের হার বৃদ্ধি খ মেধা পাচার
গ অবকাঠামো সম্প্রসারন ঘ রপ্তানি আয় বৃদ্ধি **উ. খ**

৩. বিশ্বব্যাংক বর্ণিত সুশাসন সূচকে কোনো দেশের সূচক ০.০০ হলে, সে দেশের সু-শাসনের অবস্থা কি বলে পরিগনিত হবে? *[৫০তম বিসিএস]*
ক নিচু মানের খ উচু মানের
গ মাঝারি মানের ঘ কোনোটিই নয় **উ. গ**

৪. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতার জন্য অগ্রাধিকার পাবে —। *[৫০তম বিসিএস]*
ক আইনসমূহ
খ টাকা
গ গুণগত শিক্ষা
ঘ অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ **উ. গ**

৫. টেকসই উন্নয়নের জন্য সু-শাসন অপরিহার্য কারন এটি– *[৫০তম বিসিএস]*
ক দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করে
খ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা করে
গ জনসংখ্যা হ্রাস করে
ঘ রাজনৈতিক দ্বন্দ দূর করে **উ. খ**

৬. কোনটি সুশাসনের আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করে? *[৫০তম বিসিএস]*
ক এটি শুধুমাত্র পরিমাপযোগ্য ফলাফলের উপর নির্ভরশীল
খ এটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ
গ এটি নৈতিক মানদন্ড ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত
ঘ এটি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয় **উ. গ**

৭. দুর্বল শাসন ব্যবস্থায় উন্নয়ন প্রকল্প ব্যর্থ হয় কারণ– *[৫০তম বিসিএস]*
ক সম্পদের অভাব
খ নাগরিকের বিরোধিতা
গ সিদ্ধান্ত গ্রহনে স্বচ্ছতা ও সততার অভাব
ঘ প্রযুক্তির অভাব **উ. গ**

৮. স্বচ্ছতা কেন সু-শাসন সম্পর্কে নাগরিকের ধারনাকে উন্নত ও স্বচ্ছ করে? *[৫০তম বিসিএস]*
ক এটি প্রশাসনিক চাপ বাড়ায়
খ এটি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কমায়
গ এটি জনগনের নজরদারি ও সচেতন মূল্যায়নের জন্য সুযোগ দেয়
ঘ উপরের সবগুলো **উ. গ**

৯. সুশাসন বিষয়ক ধারণাটি প্রথম কোন খ্রিষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে- *[৪৭তম বিসিএস]*
ক ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে খ ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ঘ ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে **উ. গ**

১০. সুশাসন বিষয়ক ধারণাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথম তাদের প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে- *[৪৭তম বিসিএস]*
ক ইউএনডিপি
খ বিশ্বব্যাংক
গ ইসলামি ইন্নয়ন ব্যাংক
ঘ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল **উ. খ**

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-৯

সুশাসনের ধারণা, উপাদান ও ভিত্তি

(Concept, Elements and Foundation of Good Governance)

সুশাসন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন ও উন্নয়ন অধ্যয়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা, জনকল্যাণ ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুশাসনের ভূমিকা অপরিহার্য। উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত– সব ধরনের রাষ্ট্রেই প্রশাসনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং জনগণের আস্থা নিশ্চিত করতে সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নয়নের একমাত্র মানদণ্ড নয়। সেই উন্নয়ন কতটা ন্যায়ভিত্তিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনগণের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে– তা নির্ধারণ করে সুশাসনের মান। তাই সুশাসন বলতে এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালিত হয় এবং প্রশাসন দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর থাকে।

সুশাসনের সঙ্গে আইনের শাসন, মানবাধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হয়, প্রশাসনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
এই অধ্যায়ে সুশাসনের ধারণা, সংজ্ঞা, উৎপত্তি, উপাদান, বৈশিষ্ট্য, পূর্বশর্ত, গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট সূচক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. শাসন : ধারণা ও সংজ্ঞা

শাসন বা Governance বলতে রাষ্ট্র, সরকার বা কোনো সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আইন ও নীতির বাস্তবায়ন এবং জনগণের সেবা নিশ্চিত করা হয়। শাসন কেবল সরকারের আদেশ বা প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন, নীতি, প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি খাত এবং জনগণের অংশগ্রহণও যুক্ত থাকে।

একটি কার্যকর শাসনব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রয়োজন পূরণ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রের আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে কাজ করলে শাসনব্যবস্থা কার্যকর হয়।

বিভিন্ন সংস্থা ও চিন্তাবিদ শাসন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন–

বিশ্বব্যাংক : Governance হলো "the manner in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development." অর্থাৎ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা প্রয়োগের ধরনই হলো Governance।

UNDP : Governance হলো "the exercise of economic, political and administrative authority in the management of a country's affairs at all levels." UNDP আরও বলে, Governance-এর মধ্যে এমন সব পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে নাগরিক ও গোষ্ঠীসমূহ নিজেদের স্বার্থ প্রকাশ করে, মতপার্থক্য মীমাংসা করে এবং আইনগত অধিকার ও দায়িত্ব পালন করে।

James N. Rosenau : "The process of governance is the process whereby an organization or society steers itself." অর্থাৎ Rosenau-এর দৃষ্টিতে governance হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে কোনো সংগঠন বা সমাজ নিজেকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

এসব সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, শাসন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম, আইনি কাঠামো, জনগণের অংশগ্রহণ এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা– সবকিছু অন্তর্ভুক্ত তাই শাসন হলো রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার সামগ্রিক প্রক্রিয়া।

২. সুশাসন : ধারণা ও সংজ্ঞা

সুশাসন বা Good Governance হলো শাসনের এমন একটি গুণগত রূপ, যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান জনগণের কল্যাণে ন্যায়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এটি কেবল সরকার পরিচালনার পদ্ধতি নয়; বরং রাষ্ট্র, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের মধ্যে দায়িত্বশীল ও ন্যায়ভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া।

সাধারণ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্র বা সরকার নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কাজ করে। কিন্তু সুশাসনে সেই কাজগুলো জনগণের অধিকার, জনকল্যাণ, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। তাই সুশাসনকে শাসনের উন্নত, ন্যায়ভিত্তিক ও জনমুখী রূপ বলা যায়।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-১০

সুশাসন প্রতিষ্ঠা: প্রতিবন্ধকতা, করণীয় ও ভূমিকা

(Establishing Good Governance: barriers, Measures and Roles)

সুশাসনের ধারণা, উপাদান ও গুরুত্ব বোঝার পর এর বাস্তব প্রয়োগের প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো রাষ্ট্রে সুশাসনের নীতি গ্রহণ করলেই তা কার্যকর হয় না; বরং তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং নাগরিক সচেতনতা। সুশাসনের অভাব রাষ্ট্র ও সমাজে নানা ধরনের সংকট তৈরি করে, আবার তা প্রতিষ্ঠার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাও থাকে। এই অধ্যায়ে সুশাসনের অভাবজনিত ক্ষতি, প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা, সহায়ক শক্তি, করণীয়, সরকার ও নাগরিকের ভূমিকা, নাগরিক জীবনে সুশাসন শিক্ষার গুরুত্ব এবং জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

১. সুশাসনের অভাবের অপকারিতা

সুশাসনের অভাব কোনো রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দুর্বলতার বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, নাগরিক অধিকার, অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং জনআস্থার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। যখন শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন ও জনমুখী প্রশাসনের ঘাটতি থাকে, তখন রাষ্ট্রের নীতি ও প্রতিষ্ঠান কার্যকর হলেও তার সুফল জনগণের কাছে সমভাবে পৌঁছায় না।

সুশাসনের অভাবের প্রধান অপকারিতাগুলো হলো–

- **প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার সংকট :** প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে।

- **আইন প্রয়োগে বৈষম্য :** আইন সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর না হলে ক্ষমতাবানরা সুবিধা পায় এবং সাধারণ নাগরিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়।

- **দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার :** জবাবদিহিতা দুর্বল হলে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও প্রশাসনিক পক্ষপাত বৃদ্ধি পায়।

- **জনসেবায় ভোগান্তি :** শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনিক সেবায় দীর্ঘসূত্রতা, হয়রানি এবং অদক্ষতা দেখা দেয়।

- **রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় :** উন্নয়ন প্রকল্প, সরকারি ব্যয় ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের দুর্বলতা তৈরি হয়।

- **মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার অনিশ্চয়তা :** মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনি সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার দুর্বল হয়ে পড়ে।

- **সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি :** প্রান্তিক, দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সুবিধা ও ন্যায্য সুযোগ থেকে বেশি বঞ্চিত হয়।

- **রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক সংঘাত :** অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হলে জনগণের ক্ষোভ, অবিশ্বাস ও সংঘাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

- **উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যকারিতা হ্রাস :** পরিকল্পনা থাকলেও দুর্বল বাস্তবায়ন, দুর্নীতি ও সমন্বয়ের অভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নফল অর্জিত হয় না।

- **মেধা পাচার ও Hidden Cost :** সুশাসনের অনুপস্থিতিতে দক্ষ ও মেধাবী মানুষেরা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যান। দেশের মেধাবী মস্তিষ্কগুলো যখন উন্নততর জীবনযাপন কিংবা উচ্চতর গবেষণার জন্য উন্নত দেশে পাড়ি জমায় এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে যায়, সেটিই ব্রেন ড্রেন বা মেধা পাচার। এর ফলে সমাজ বা দেশকে বহন করতে হয়– শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের অপচয় (দেশের টাকায় শিক্ষিত করে পরে অন্য দেশ লাভবান হয়), দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ক্ষতি (উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা, নেতৃত্বের অভাব), সমাজের উন্নয়নের গতি কমে যাওয়া।

উল্লেখ্য, এটি একটি hidden cost, কারণ এর ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়; কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বিশ্বব্যাংক, UNDP এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর গবেষণায় এটিকে সুশাসনের অভাবের অন্যতম প্রধান পরোক্ষ খরচ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

সুশাসনের অভাব প্রথমে প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে, পরে সেই দুর্বলতা আইন প্রয়োগ, জনসেবা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক অধিকারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে, জনআস্থা কমে এবং শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার নৈতিক বৈধতা হারাতে থাকে।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-১১

সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক অনুষঙ্গ

(Institutional and Social Dimensions of Good Governance)

সুশাসন কেবল নীতি, আইন বা প্রশাসনিক দক্ষতার ওপর নির্ভর করে না; এটি কার্যকর হয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের জবাবদিহিমূলক শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে। আমলাতন্ত্র নীতি বাস্তবায়ন ও জনসেবা প্রদানের প্রধান প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করে; মানবাধিকার নাগরিক মর্যাদা ও আইনের শাসনের মানদণ্ড নির্ধারণ করে; গণমাধ্যম তথ্যপ্রবাহ, জনপর্যবেক্ষণ ও ক্ষমতার ওপর সামাজিক নজরদারি নিশ্চিত করে; সুশীল সমাজ সংগঠিত নাগরিক অংশগ্রহণ, গবেষণা, মতামত ও নীতিগত চাপের মাধ্যমে জবাবদিহিতা শক্তিশালী করে। একইভাবে শ্বেতপত্রের মতো আনুষ্ঠানিক দলিল রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত, নীতি বা সংকট সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে। এই অধ্যায়ে সুশাসনের এসব প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক অনুষঙ্গ আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১. আমলাতন্ত্র ও সুশাসন

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অনুষঙ্গ। রাষ্ট্রের আইন, নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকর করার প্রধান দায়িত্ব প্রশাসনের ওপর ন্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব নীতি নির্ধারণ করলেও সেই নীতির বাস্তব প্রয়োগ, জনসেবা প্রদান, সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নথি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কাজ মূলত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

সুশাসনের আলোচনায় আমলাতন্ত্রকে কেবল দপ্তর বা সরকারি কর্মচারীদের সমষ্টি হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। এটি একটি সংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার কার্যকারিতা নির্ভর করে নিয়মতান্ত্রিকতা, পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা, দক্ষতা এবং জবাবদিহিতার ওপর। আমলাতন্ত্র দক্ষ ও জনমুখী হলে সুশাসন বাস্তবায়ন সহজ হয়; কিন্তু এটি যদি জটিল, ধীর, পক্ষপাতদুষ্ট বা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তবে ভালো নীতিও বাস্তবে কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে পারে না।

আমলাতন্ত্র বা Bureaucracy বলতে এমন এক প্রশাসনিক সংগঠনকে বোঝায়, যেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম, পদক্রম, দায়িত্ববণ্টন, বিশেষায়িত কাজ এবং লিখিত পদ্ধতির ভিত্তিতে সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনায় আমলাতন্ত্র অপরিহার্য, কারণ রাষ্ট্রের কার্যক্রম জটিল, বহুমুখী এবং ধারাবাহিক; এগুলো পরিচালনার জন্য স্থায়ী ও সংগঠিত প্রশাসনিক কাঠামো প্রয়োজন।

ম্যাক্স ওয়েবার আমলাতন্ত্রকে আধুনিক প্রশাসনের একটি যুক্তিবাদী ও নিয়মভিত্তিক রূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ওয়েবারের আদর্শ আমলাতন্ত্রে পদক্রম, লিখিত নথি, নির্দিষ্ট দায়িত্ব, বিশেষায়িত দক্ষতা, নিয়মের অধীন সিদ্ধান্ত এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষ আচরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে পরবর্তীতে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ সুশাসনে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাষ্ট্রের অধিকাংশ নীতি ও সেবা নাগরিকের কাছে পৌঁছায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। আইন প্রণয়ন বা নীতি ঘোষণা রাজনৈতিক পর্যায়ে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবায়নের স্তরে প্রশাসনের দক্ষতা, সততা ও পেশাদারিত্বই সুশাসনের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে।

সুশাসনে আমলাতন্ত্রের প্রধান ভূমিকা–

নীতি বাস্তবায়ন : সরকার যে নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রশাসনের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, স্থানীয় সরকার, নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্প–সব ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্র বাস্তব কাজ সম্পন্ন করে।

আইন ও বিধির প্রয়োগ : প্রশাসন আইন, বিধি ও সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। আইন প্রয়োগে নিরপেক্ষতা বজায় থাকলে আইনের শাসন শক্তিশালী হয়।

জনসেবা প্রদান : নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন–সনদ, লাইসেন্স, ভূমি সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সহায়তা, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা : রাজনৈতিক পরিবর্তন হলেও আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রের নিয়মিত কার্যক্রম চালু রাখে। এই ধারাবাহিকতা প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য, নথি ও প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে সহায়তা : প্রশাসন সরকারি তথ্য, পরিসংখ্যান, নথি, প্রতিবেদন ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণে সহায়তা করে।

জবাবদিহিতা ও তদারকি বাস্তবায়ন : অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, প্রতিবেদন, মূল্যায়ন, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রশাসনিক তদারকির মাধ্যমে আমলাতন্ত্র দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা গঠনে ভূমিকা রাখে।

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-১২

মূল্যবোধ ও সুশাসনের অভাবে সামাজিক অবক্ষয় ও প্রতিকার
(Social Degradation and Remedies Caused by Lack of Values and Good Governance)

সমাজের স্থিতি, শান্তি ও উন্নয়ন কেবল আইন, প্রতিষ্ঠান বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে না; এর ভিত্তি গড়ে ওঠে মানুষের মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং রাষ্ট্রীয় সুশাসনের ওপর। যখন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সততা, সহনশীলতা, মানবিকতা, শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন ও কার্যকর প্রশাসনের ঘাটতি দেখা দেয়, তখন সামাজিক অবক্ষয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অপসংস্কৃতি, নাগরিক সমস্যা, জনসংখ্যার চাপ, শিশু-কিশোর সমস্যা, কিশোর অপরাধ, যুবসমাজের অবক্ষয়, বেকারত্ব, নারী ও শিশু নির্যাতন, ইভ টিজিং, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, খাদ্যে ভেজাল, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মব কালচার – এসব সমস্যা আলাদা আলাদা মনে হলেও এগুলোর গভীরে মূল্যবোধের সংকট ও সুশাসনের দুর্বলতা কাজ করে। তাই এসব সমস্যাকে কেবল আইনশৃঙ্খলা বা সামাজিক সমস্যা হিসেবে নয়, বরং নৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সুশাসনগত সংকট হিসেবেও বোঝা প্রয়োজন।

সামাজিক অবক্ষয় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র– সব স্তরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়, যুবসমাজ বিপথগামী হয়, নারী ও শিশু নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে, জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দুর্নীতি ও অপরাধ বাড়ে, আইনের শাসনের প্রতি মানুষের আস্থা কমে এবং জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য তাই মূল্যবোধের চর্চা এবং সুশাসনের বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

এই অধ্যায়ে মূল্যবোধ ও সুশাসনের অভাবে সৃষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলোর ধারণা, কারণ, প্রভাব, আইনগত কাঠামো এবং প্রতিকার আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেখানো হয়েছে– নৈতিক শিক্ষা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা, আইনের কার্যকর প্রয়োগ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, নাগরিক সচেতনতা, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং জবাবদিহিমূলক প্রশাসন কীভাবে সামাজিক অবক্ষয় রোধে সহায়ক হতে পারে।

১. অপসংস্কৃতি

১.১ অপসংস্কৃতির ধারণা

সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়গুলোর মধ্যে সংস্কৃতি (Culture) অন্যতম। মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, বিচারবুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, জীবনযাপন ও মূল্যবোধের মার্জিত সমন্বিত রূপকে সংস্কৃতি বলা যায়। Culture শব্দটি ল্যাটিন Colere থেকে এসেছে, যার অর্থ কর্ষণ করা, চাষ করা বা পরিচর্যা করা। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি হলো তার সংস্কৃতি।

অপরদিকে, অপসংস্কৃতি (Malculture/Degenerative Culture) বলতে এমন সংস্কৃতিকে বোঝায়, যা কোনো সমাজের মূলধারার সুস্থ, নৈতিক, রুচিশীল ও ইতিবাচক মূল্যবোধের পরিপন্থী। যখন কোনো বিদেশি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ, বিকৃত আচরণ, অশ্লীল বিনোদন বা নৈতিকতা বিরোধী জীবনধারা কোনো জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য, সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন তাকে অপসংস্কৃতি বলা হয়।

অপসংস্কৃতিকে সাধারণত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। তবে সব নতুন পরিবর্তনই অপসংস্কৃতি নয়। কোনো নতুন গান, পোশাক, প্রযুক্তি বা জীবনযাপন পদ্ধতিকে সমাজ প্রথমে অস্বস্তির চোখে দেখলেও সময়ের সঙ্গে তা স্বাভাবিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে যেতে পারে। তাই অপসংস্কৃতি চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হলো– তা কি সমাজের নৈতিকতা, মানবিকতা, রুচিবোধ, সামাজিক সংহতি ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করছে কি না।

১.২ অপসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা

- Cultural Degradation – সংস্কৃতির অবক্ষয়;
- Cultural Decadence – সাংস্কৃতিক অধঃপতন;
- Counterculture – মূলধারার সংস্কৃতির বিরোধী সংস্কৃতি;
- Cultural Imperialism – শক্তিশালী সংস্কৃতির দুর্বল সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য;
- Cultural Homogenization – সংস্কৃতির একরূপীকরণ;
- Cultural Lag – বস্তুগত সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তনের তুলনায় মূল্যবোধ, নীতি ও সামাজিক মানদণ্ডের পিছিয়ে পড়া।

অধ্যায়-১৩

সুশাসন: বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

(Good Governance: Global and Bangladesh Perspective)

সুশাসনকে পূর্ণভাবে বুঝতে হলে এর বৈশ্বিক মানদণ্ড, জাতীয় বাস্তবতা এবং ক্ষেত্রভিত্তিক প্রয়োগ–এই তিনটি স্তর একসঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুশাসন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, টেকসই উন্নয়ন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত; বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি সংবিধানিক মূল্যবোধ, প্রশাসনিক দক্ষতা, তথ্যপ্রাপ্তি, দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্থানীয় সরকার, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং জনসেবা প্রাপ্তির বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসনের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়– অর্থনীতিতে এটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক জবাবদিহিতা, রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতার দায়বদ্ধতা, আর সমাজে অন্তর্ভুক্তি, অধিকার ও জনআস্থার ভিত্তি তৈরি করে। এই অধ্যায়ে সুশাসনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং ক্ষেত্রভিত্তিক প্রয়োগ আলোচনা করা হয়েছে।

১. সুশাসন : বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

সুশাসন এখন কেবল কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ধারণা নয়; এটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, মানবাধিকার, দুর্নীতি প্রতিরোধ, টেকসই উন্নয়ন এবং রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা মূল্যায়নের একটি বৈশ্বিক মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক, UNDP, জাতিসংঘ, আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচক সুশাসনকে উন্নয়নের গুণগত শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুশাসনের গুরুত্ব বেড়েছে কয়েকটি কারণে। উন্নয়ন এখন শুধু GDP প্রবৃদ্ধি বা অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বিচার করা হয় না; বরং উন্নয়ন কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং মানবাধিকার সম্মত–তাও বিবেচনায় আনা হয়। একইভাবে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আইনের শাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সরকারি সেবার মান, অংশগ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১.১ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুশাসনের ধারণা

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুশাসন বলতে এমন শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এসব মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার, অংশগ্রহণ, কার্যকর প্রশাসন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন।

আধুনিক উন্নয়ন আলোচনায় সুশাসন বিশেষ গুরুত্ব পায় ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক সংকট, প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দারিদ্র্য মোকাবিলার অভিজ্ঞতা থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বুঝতে পারে যে অর্থনৈতিক সহায়তা বা উন্নয়ন প্রকল্প তখনই কার্যকর হয়, যখন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলকভাবে কাজ করে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুশাসনের ধারণা কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়–

ক্ষেত্র	সুশাসনের প্রাসঙ্গিকতা
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন	উন্নয়ন সহায়তা, দারিদ্র্য হ্রাস, জনসেবা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সুশাসনকে শর্ত ও মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়।
মানবাধিকার	মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য আইনের শাসন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, প্রতিকার ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন।
দুর্নীতি প্রতিরোধ	রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জনসেবায় স্বচ্ছতা না থাকলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।
টেকসই উন্নয়ন	অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান, শান্তিপূর্ণ সমাজ ও ন্যায়বিচারকে টেকসই উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বৈশ্বিক সূচক ও মূল্যায়ন	WGI, rule of law, corruption perception, public sector effectiveness ইত্যাদি সূচকের মাধ্যমে সুশাসনের মান তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

অর্থাৎ, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সুশাসন হলো উন্নয়ন, মানবাধিকার, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার একটি সম্মিলিত ধারণা।

১.২ বৈশ্বিক পর্যায়ে সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য

বৈশ্বিক পর্যায়ে সুশাসনের বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, মানবাধিকার কাঠামো, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং governance indicators-এর আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায়। এগুলো কোনো একক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক মান নয়; বরং তুলনামূলক রাষ্ট্রবিশ্লেষণে ব্যবহৃত সাধারণ মানদণ্ড।

অধ্যায়-১৪

বিভিন্ন উন্নয়ন সূচক
(Various Development Indicators)

আধুনিক বিশ্বে কোনো দেশের উন্নয়ন কেবল আয়, উৎপাদন বা অবকাঠামো দিয়ে বিচার করা হয় না; উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকে সুশাসন, মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈষম্য কমানো এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন। এ কারণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সূচক ও উন্নয়ন কাঠামো কোনো রাষ্ট্রের সামগ্রিক অগ্রগতি বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিশ্ব সুশাসন সূচক (Worldwide Governance Indicators) একটি দেশের শাসনব্যবস্থা, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সরকারি কার্যকারিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের অবস্থা বোঝাতে সাহায্য করে। মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) মানুষের দীর্ঘায়ু, শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানকে উন্নয়নের কেন্দ্রে আনে। অন্যদিকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে লক্ষ্যভিত্তিক কাঠামো দিয়েছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য এসব সূচক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এগুলোর মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি, সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সুরক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য মূল্যায়ন করা যায়।

এই অধ্যায়ে বিশ্ব সুশাসন সূচক (WGI), মানব উন্নয়ন সূচক (HDI), সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs), টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), দুর্নীতির ধারণা সূচক (CPI) ইত্যাদির ধারণা, কাঠামো, উপাদান, বাংলাদেশের অবস্থান, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. বিশ্ব সুশাসন সূচক (WGI)

১.১ WGI-এর ধারণা

বিশ্ব সুশাসন সূচক (Worldwide Governance Indicators, WGI) হলো বিশ্বব্যাংকের একটি আন্তর্জাতিক সূচক ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আইনের শাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়।

WGI মূলত governance বা শাসন ব্যবস্থার গুণগত মান পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ পরিবেশ, প্রশাসনিক সক্ষমতা, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ WGI-এর উৎস ও প্রকাশনা

WGI বিশ্বব্যাংকের একটি বহুল ব্যবহৃত উদ্যোগ। ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হওয়া দেশভিত্তিক সুশাসন সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে ১৯৯৯ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

বর্তমান পদ্ধতিতে WGI ২০০টিরও বেশি দেশ ও অর্থনীতির governance performance তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন household survey, firm survey, expert assessment, international organization, NGO, academic institution এবং private data source থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

১.৩ WGI-এর ছয়টি মাত্রা

WGI সুশাসনকে ছয়টি প্রধান মাত্রায় বিশ্লেষণ করে–

ক্রম	নির্দেশক	English term	মূল বিষয়
১	মতপ্রকাশ ও জবাবদিহিতা	Voice and Accountability	নাগরিকের মতপ্রকাশ, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক অধিকার ও জবাবদিহিতা
২	রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহিংসতার অনুপস্থিতি	Political Stability and Absence of Violence/ Terrorism	রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের ঝুঁকি
৩	সরকারি কার্যকারিতা	Government Effectiveness	জনসেবা, প্রশাসনিক দক্ষতা, নীতির বাস্তবায়নক্ষমতা
৪	নিয়ন্ত্রণের গুণগত মান	Regulatory Quality	নীতি ও বিধিনিয়ন্ত্রণের মান, বেসরকারি খাতের জন্য সহায়ক পরিবেশ

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-১৫

ই-গভর্নেন্স
(E-governance)

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকসেবা, প্রশাসনিক কার্যক্রম, তথ্যপ্রবাহ ও জবাবদিহিতা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এখন কেবল অফিসের কাজ সহজ করার উপায় নয়; বরং এটি রাষ্ট্র পরিচালনা, সেবা প্রদান, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই প্রযুক্তি নির্ভর শাসনব্যবস্থাকেই বলা হয় ই-গভর্নেন্স (E-Governance)।

ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারি সেবা দ্রুত, স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ীভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও কর প্রদানের মতো নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সরকারি ক্রয় পর্যন্ত বহু ক্ষেত্রে ডিজিটাল সেবা নাগরিকের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমায়। একই সঙ্গে সরকারি কাজের রেকর্ড, ট্র্যাকিং ও অনলাইন ব্যবস্থাপনা প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্সের বিস্তার ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ই-নথি/ডি-নথি, MyGov, e-Passport, e-GP, e-Payment, স্বাস্থ্য বাতায়ন, ৩৩৩ ও ৯৯৯-এর মতো সেবাগুলো নাগরিকবান্ধব প্রশাসনের উদাহরণ। তবে ডিজিটাল বৈষম্য, প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য সুরক্ষা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং জনআস্থার প্রশ্ন এখনও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

এই অধ্যায়ে ই-গভর্নেন্সের ধারণা, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, মডেল, বাংলাদেশে এর বর্তমান চিত্র, প্রতিবন্ধকতা, সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক, ই-ভোটিং, ই-পাসপোর্ট, ই-গেট, জরুরি নাগরিক সেবা নম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ই-গভর্নেন্সের ধারণা

১.১ ই-গভর্নেন্স কী?

ই-গভর্নেন্স (E-governance) শব্দটি Electronic Governance-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। একে ডিজিটাল গভার্নেন্স (Digital Governance), অনলাইন গভার্নেন্স (Online Governance) বা প্রযুক্তি চালিত গভার্নেন্সও বলা হয়।

ই-গভর্নেন্স হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা ICT (Information and Communication Technology) ব্যবহার করে সরকারি সেবা, তথ্য, সিদ্ধান্ত, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নাগরিক সুবিধা দ্রুত, স্বচ্ছ, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী উপায়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আধুনিক শাসনব্যবস্থা। এটি শুধু সরকারি কাজকে কম্পিউটারাইজড করা নয়; বরং সরকারি সেবা প্রদানের পদ্ধতি, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, নাগরিক অংশগ্রহণ, তথ্যপ্রবাহ ও জবাবদিহিতায় গুণগত পরিবর্তন আনা।

১.২ গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

বিশ্বব্যাংক এর মতে, "ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য শাখার মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায়।"

জাতিসংঘ (২০০৬) এর মতে, "সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং World Wide Web (WWW)-এর মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।"

ড. এপিজে আব্দুল কালাম এর মতে, "স্বচ্ছ, নিশ্চিত, গ্রহণযোগ্য ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও অবিকৃত সেবা দেয়ার উৎকৃষ্ট মাধ্যমই হলো ই-গভর্নেন্স।"

UNESCO এর মতে, "নাগরিকদের আইনগত অধিকার সম্পাদনের জন্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষতা, দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে জনগণ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনরত অন্যান্য সংস্থাকে তথ্য সরবরাহ করা।"

চন্দ্রবাবু নাইডু এর মতে, "ই-গভর্ন্যান্স হলো Smart Government..."

১.৩ ই-গভর্নেন্সের ধারণাগত দিক

ম্যাথিয়াস ফিঞ্জার ও গেইলি পিকাউড (Matthias Finger & Gaelle Pecoud) ই-গভর্নেন্সের তিনটি প্রধান ধারণার কথা উল্লেখ করেন–

১. জনসন্তুষ্টি বা সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি (Customer Satisfaction);
২. প্রক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়া (Processes and Interaction);
৩. উপকরণ বা প্রযুক্তিগত মাধ্যম (Tools)।

হিকস বা Heeks ই-গভর্নেন্সের তিনটি প্রধান ক্ষেত্র উল্লেখ করেন–

১. ই-প্রশাসন (E-administration) : সরকারি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন;

২. ই-সেবা (E-services) : সরকার ও নাগরিকের সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সেবা সহজীকরণ;

অধ্যায়-১৬

উন্নয়ন ও অধিকার
(Development and Human Rights)

উন্নয়ন বলতে সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত অগ্রগতিকে বোঝায়। সনাতন উৎপাদনব্যবস্থা থেকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর, মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, মানবসম্পদের বিকাশ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নাগরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সমন্বিত প্রক্রিয়াই উন্নয়ন।

উন্নয়ন কেবল আয় বৃদ্ধি নয়; বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, মানবাধিকার, সুশাসন ও সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নের সঙ্গেও সম্পর্কিত।

১. সামাজিক উন্নয়ন

সামাজিক উন্নয়ন (Social Development) হচ্ছে সমাজের মানুষের সমতাভিত্তিক ও কল্যাণমুখী উন্নয়ন। সামাজিক উন্নয়ন বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান, মানবসম্পদ, কাম্য জনসংখ্যা, পরিবেশ, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক খাতের পূর্বাবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় পরিবর্তনকে বোঝায়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান, আয়ুষ্কাল, মানবসম্পদ এবং সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থান দেখে কোনো দেশের সামাজিক উন্নয়নের স্তর বোঝা যায়।

সমাজবিজ্ঞানী James Midgley সামাজিক উন্নয়নকে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক উন্নয়ন হলো গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণকর অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া।

সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা;
- সচেতনতা বৃদ্ধি;
- ক্ষমতায়ন;
- সামাজিক গতিশীলতা;
- মানবসম্পদের উন্নয়ন;
- টেকসই উন্নয়ন।

সামাজিক উন্নয়নের সূচক

- জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন;
- দারিদ্র্য মুক্তি;
- শিক্ষার প্রসার;
- বেকারত্ব হ্রাস;
- সামাজিক ন্যায়বিচার;
- সুস্বাস্থ্য;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- সুশাসন;
- সামাজিক নিরাপত্তা।

২. রাজনৈতিক উন্নয়ন

রাজনৈতিক উন্নয়ন (Political Development) বলতে রাজনৈতিক কাঠামো, প্রতিষ্ঠান, অংশগ্রহণ, বৈধতা, দক্ষতা ও নাগরিক সম্পৃক্ততার উন্নয়নকে বোঝায়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর স্থিতিশীল, অংশগ্রহণমূলক, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর হয়।

রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোসমূহে স্বতন্ত্রীকরণ, সমতা স্থাপন ও দক্ষতা বৃদ্ধির এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জাতি গঠন ও রাষ্ট্রক্ষমতার বৈধতা শক্তিশালী হয়।

রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক উন্নয়ন। রাজনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া গণতন্ত্র, সুশাসন, অংশগ্রহণ, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

অধ্যাপক Lucian W. Pye রাজনৈতিক উন্নয়নকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি রাজনৈতিক উন্নয়নের সূচক বা development syndrome হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেন–

- সমতা (Equality);
- সক্ষমতা (Capacity);
- বৈধতা (Legitimacy);
- অংশগ্রহণ (Participation);
- পৃথকীকরণ বা বিশেষায়ন (Differentiation);
- সংহতি (Integration)।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য

Gabriel Almond-এর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার দক্ষতা বা সামর্থ্য কয়েকটি কার্যাবলীর মাধ্যমে যাচাই করা যায়–

- রূপান্তর (Conversion);
- পরিচালনা/রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance);
- অভিযোজনমূলক সক্ষমতা (Adaptation)।

রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা

Almond ও Powell রাজনৈতিক উন্নয়নের চারটি মূল সমস্যা চিহ্নিত করেছেন–

১. রাষ্ট্র গঠন (State Building);
২. জাতি গঠন (Nation Building);
৩. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (Political Participation);
৪. বণ্টন ও কল্যাণ সাধন (Distribution and Welfare)।

অধ্যায়-১৭

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র
(Family, Society and State)

মানুষ জন্মের পর প্রথম যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হলো পরিবার। পরিবার থেকেই মানুষ ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, ভাষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণ শেখে। পরিবারগুলো পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজ গঠন করে। আর সমাজের রাজনৈতিক সংগঠিত রূপ– যেখানে জনগণ, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, সেটিই রাষ্ট্র।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়; বরং একটির সঙ্গে অন্যটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পরিবার ব্যক্তি গড়ে তোলে, সমাজ ব্যক্তিকে সামাজিক পরিচয় ও আচরণবিধি দেয়; আর রাষ্ট্র আইন, প্রশাসন, অধিকার, কর্তব্য, নিরাপত্তা ও শাসনব্যবস্থার কাঠামো প্রদান করে। তাই নাগরিক জীবন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বুঝতে হলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে– ঐশী মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ এবং ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ। এসব মতবাদ রাষ্ট্রের জন্ম ও বিকাশকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান– জনগণ, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক সংগঠন থেকে পৃথক করে। আর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, কার্যাবলি ও ধরন নির্ধারণ করে রাষ্ট্র কীভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হবে।

এই অধ্যায়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ধারণা, উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ, রাষ্ট্রের উপাদান, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, রাষ্ট্রের ধরন ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

১. পরিবার

১.১ পরিবারের ধারণা

পরিবার (Family) হলো বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে আবদ্ধ ব্যক্তিদের একটি ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠী। পরিবারের সদস্যরা সাধারণত একত্রে বসবাস করে, স্নেহ-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে এবং সাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করে।

পরিবার সমাজের সবচেয়ে আদিম, মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তির জন্ম, লালন-পালন, সামাজিকীকরণ, মূল্যবোধ শিক্ষা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক পরিচয় গঠনে পরিবারের ভূমিকা অপরিহার্য।

মার্কসীয় আলোচনায় পরিবারের উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পত্তি, শ্রমবিভাগ এবং সামাজিক কাঠামোর সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। Friedrich Engels তাঁর *The Origin of the Family, Private Property and the State* গ্রন্থে পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন। মার্কসীয় ধারণা অনুযায়ী, আদিম শিকার ও খাদ্য সংগ্রহভিত্তিক সমাজে পরিবার ব্যবস্থায় মাতৃতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

১.২ শব্দের উৎপত্তি

ইংরেজি Family শব্দটি ল্যাটিন famulus এবং familia থেকে এসেছে। Famulus অর্থ ভৃত্য বা চাকর; আর familia বলতে প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় এক ছাদের নিচে বসবাসকারী আত্মীয়, ভৃত্য, দাস-দাসী এবং গৃহস্থালির সমষ্টিকে বোঝানো হতো। পরবর্তীতে শব্দটি আধুনিক অর্থে পরিবার বা আত্মীয়তাভিত্তিক গৃহগোষ্ঠী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

১.৩ পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি সংজ্ঞা

- MacIver and Page তাঁদের *Society : An Introductory Analysis* গ্রন্থে পরিবারকে এমন একটি গোষ্ঠী হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক থাকে এবং সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের স্থায়ী ব্যবস্থা থাকে।

- Gisbert তাঁর *Fundamentals of Sociology* গ্রন্থে পরিবারকে একটি জৈব একক হিসেবে দেখেছেন, যেখানে সদস্যরা একই আবাসে বসবাস করে এবং স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত রূপ পায়।

- Ogburn and Nimkoff-এর মতে, পরিবার হলো মোটামুটি স্থায়ীভাবে একসঙ্গে বসবাসকারী স্বামী-স্ত্রী বা নর-নারীর গোষ্ঠী; তাদের সন্তান থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

- Lewis Henry Morgan-এর *Ancient Society*, MacIver and Page-এর *Society : An Introductory Analysis* এবং M. M. Nimkoff-এর *Marriage and the Family* পরিবার অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে আলোচিত।

অধ্যায়-১৮
রাজনৈতিক ব্যবস্থা
(Political System)

রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি, ক্ষমতার উৎস, জনগণের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংগঠন, স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা এবং প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া–এসবের সমন্বিত রূপ হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কোনো রাষ্ট্রে জনগণ কীভাবে শাসন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হবে, সরকার কীভাবে গঠিত হবে, রাজনৈতিক দল কী ভূমিকা পালন করবে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কীভাবে নীতি ও জনমতকে প্রভাবিত করবে এবং নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে–এসব প্রশ্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র জনগণের অংশগ্রহণ, ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন ও জবাবদিহিমূলক সরকারের ধারণাকে গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে সমাজতন্ত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, শোষণমুক্ত সমাজ এবং সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টনের ওপর জোর দেয়। রাজনৈতিক দল জনগণের মতামতকে সংগঠিত করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে; আর চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরাসরি সরকার গঠন না করেও নির্দিষ্ট স্বার্থ, দাবি বা জনমতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নীতি ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

নির্বাচন রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি মৌলিক উপাদান। এর মাধ্যমে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে, সরকারকে বৈধতা দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই সুষ্ঠু, অবাধ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, উপনির্বাচন এবং গণভোটের মতো বিভিন্ন প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়ে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজনৈতিক দল, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, নির্বাচন এবং বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ধারণা, বৈশিষ্ট্য, ধরন, কার্যাবলি, পূর্বশর্ত ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. গণতন্ত্র

১.১ গণতন্ত্রের ধারণা

গণতন্ত্র (Democracy) হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণ সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং শাসকরা জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

গণতন্ত্রকে সাধারণভাবে "জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার" বলা হয়। এই জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট Abraham Lincoln প্রদত্ত।

গণতন্ত্রে নাগরিকদের ভোটাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং জবাবদিহিমূলক সরকার গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ শব্দের উৎপত্তি

Democracy শব্দটি গ্রিক Demos এবং Kratos থেকে এসেছে। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratos অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। তাই আক্ষরিক অর্থে গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন।

প্রাচীন গ্রিসের এথেন্স নগররাষ্ট্রে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা দেখা যায়। তবে আধুনিক গণতন্ত্র মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক, সাংবিধানিক ও অধিকারভিত্তিক শাসনব্যবস্থা। প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় গ্রিসের নগররাষ্ট্র এথেন্সে। তাই গ্রিসকে বলা হয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার। আধুনিক গণতন্ত্রের সূতিকাগার হলো যুক্তরাজ্য। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলো ভারত।

১.৩ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

- জনগণ ক্ষমতার উৎস;
- জবাবদিহিমূলক সরকার;
- শক্তিশালী বিরোধী দল;
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;
- আইনের শাসন;
- নিয়মিত, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন;
- প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার;
- মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা;
- মতপ্রকাশ, সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা;
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

১.৪ গণতন্ত্রের ধরন

ধরন	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)	জনগণ সরাসরি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে	প্রাচীন এথেন্স

Live MCQ
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

অধ্যায়-১৯

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাঠামো (State and Administrative Structure of Bangladesh)

একটি রাষ্ট্র কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য কেবল সংবিধান বা আইন থাকলেই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় অঙ্গ, প্রশাসনিক কাঠামো, ক্ষমতার বিভাজন এবং জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো মূলত নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব সাংবিধানিক অবস্থান, ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দেশ। এখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা। প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, আর বিচার বিভাগ আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাঠামো বুঝতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্র, মন্ত্রণালয়, মাঠ প্রশাসন, জাতীয় সংসদ, সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ধারণা জানা জরুরি। এসব প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া সুশাসন, গণতন্ত্র, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ

১.১ নির্বাহী বিভাগের ধারণা

নির্বাহী বিভাগ (Executive Branch) হলো সরকারের সেই অঙ্গ, যা রাষ্ট্রের আইন ও নীতি বাস্তবায়ন করে, প্রশাসন পরিচালনা করে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করে এবং দৈনন্দিন শাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

সরকার সাধারণত তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত–

১. আইন বিভাগ;
২. নির্বাহী বিভাগ;
৩. বিচার বিভাগ।

বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ মূলত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

১.২ সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ

বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশে প্রধানত অনুচ্ছেদ ৪৮ থেকে ৬১ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রীগণ, রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যসম্পাদন সম্পর্কে বিধান রয়েছে।

১.৩ নির্বাহী বিভাগের প্রধান উপাদান

উপাদান	পরিচিতি
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রপ্রধান; রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী কার্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়
প্রধানমন্ত্রী	সরকারপ্রধান; বাস্তব নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র
মন্ত্রিসভা	প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত নীতিনির্ধারণী কাঠামো
প্রশাসন	মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সচিবালয় ও মাঠ প্রশাসনের মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়ন করে

১.৪ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার পার্থক্য

বাংলাদেশ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার দেশ। তাই রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও কার্যত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই রাষ্ট্রের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

বিষয়	রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
অবস্থান	রাষ্ট্রপ্রধান	সরকারপ্রধান
ভূমিকা	সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা বেশি	বাস্তব নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান
নিয়োগ/নির্বাচন	সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত	সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন

মডেল টেস্ট

মডেল টেস্ট-০১

১. নৈতিকতা কীসের সাথে সম্পর্কিত?
ⓚ সামাজিক আইন
ⓖ রাজনৈতিক অধিকার
ⓖ মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ
ⓖ অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২. সততা ও ন্যায়পরায়ণতা কীসের অংশ?
ক) মূল্যবোধ খ) ব্যক্তিগত দক্ষতা
গ) প্রশাসনিক ক্ষমতা ঘ) আইনি বৈধতা

৩. সুশাসন ধারণার প্রবক্তা কে?
ক) বিশ্বব্যাংক খ) জাতিসংঘ
গ) আইএমএফ ঘ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

৪. যেকোন প্রতিষ্ঠানের 'হুইসেলব্লোয়ার' কে?
ক) প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক কাজের তথ্য উদঘাটনকারী
খ) প্রতিষ্ঠানের অভিযোগকারী কর্মী
গ) প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক আচরণকারী
ঘ) প্রতিষ্ঠানের বিবাদ নিরসনকারী

৫. সামাজিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?
ক) আইন খ) ধর্ম গ) সংস্কৃতি ঘ) উপরের সবকটি

৬. 'অপরাধ একটি সামাজিক ঘটনা এবং সমাজের স্বাভাবিক রূপ'– কথাটি কে বলেছেন?
ক) কার্ল মার্কস খ) ম্যাক্স ওয়েবার
গ) এমিল ডুর্খেইম ঘ) অগাস্ট কোঁৎ

৭. সুশাসনের পূর্বশর্ত কোনটি?
ক) উন্নয়ন খ) গণমাধ্যম
গ) জবাবদিহিতা ঘ) নির্বাচন

৮. একটি প্রতিষ্ঠানের নৈতিক পরিবেশ নির্ধারণের জন্য প্রধানত কোন অংশীজন গোষ্ঠী দায়ী?
ক) কর্মচারী
খ) সরবরাহকারী
গ) গ্রাহক
ঘ) পরিচালক পর্ষদ এবং উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা

৯. আইনের শাসনের মূলকথা কোনটি?
ক) বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে
খ) সরকারের প্রাধান্য
গ) আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান
ঘ) ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক

১০. গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র হলো–
ক) স্বাধীনতা খ) সাম্য গ) ভ্রাতৃত্ব ঘ) বর্ণিত সবগুলো

১১. 'লাল ফিতার দৌরাত্ম্য' কোথায় দেখা যায়?
ক) রাজনীতিতে খ) আমলাতন্ত্রে
গ) অর্থনীতিতে ঘ) সমাজে

১২. স্বচ্ছতার সঙ্গে কোন শব্দটির সংশ্লিষ্টতা ব্যাপক?
ক) অবাধ তথ্য প্রবাহ খ) সংবেদনশীলতা
গ) নিরপেক্ষতা ঘ) গোপনীয়তা

১৩. অন্যের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো এবং সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া মূল্যবোধের কোন উপাদানকে নির্দেশ করে?
ক) নৈতিকতা খ) সহমর্মিতা
গ) দায়িত্বশীলতা ঘ) নান্দনিকতা

১৪. একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে–
ক) গণমাধ্যম খ) সরকার
গ) বিরোধী দল ঘ) সুশীল সমাজ

১৫. চাপ সৃষ্টিকারীগোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা
খ) গোষ্ঠী স্বার্থ আদায় করা
গ) জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া
ঘ) জনকল্যাণে কাজ করা

উত্তরপত্র

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গ	ক	ক	ক	ঘ	গ	গ	ঘ	গ	ঘ
১১	১২	১৩	১৪	১৫					
ঘ	ক	খ	ক	খ					

মডেল টেস্ট-০২

১. জাতিসংঘ (UN) সুশাসন বাস্তবায়নে কয়টি মূলনীতি অনুসরণ করে?
ক) ৮টি খ) ৫টি গ) ৬টি ঘ) ৩টি

২. 'যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তি হচ্ছে আইন।' উক্তিটি কার?
ক) সক্রেটিস খ) টমাস হবস
গ) অধ্যাপক হল্যান্ড ঘ) এরিস্টটল

৩. সরকারি দল ও বিরোধী দল সমূহের মধ্যকার তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয় কীসের অভাবে?
ক) জনঅংশগ্রহণের অভাব খ) সরকারের অদক্ষতার অভাব
গ) পরমতসহিষ্ণুতার অভাব ঘ) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ